Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 113-124
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও দশাবতার

তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এস.ভি.এস.জি.সি., ইউ.জি.সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ
সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

We can see the variety scenario of mythological, social, historical etc. to become established for decorating the architecture bodies of Bengal's terracotta temples. These pictures not only established to increase the elegance of those temples, it has some social and cultural values. For decorating the each temples of Bengal the pictures of mythological stories had created a different measure. Those mythological stories which had taken place at bodies for elegance of different terracotta temples of Bengal are story of Ramayana, story of Mahabharata, story of dalliance of Krishna and other mythological god and goddess's story and picture's plaques. Presently our research's topic is "architecture of Bengal's terracotta temples and ten incarnations". In grain and river based Bengal we can see different types temples. There had been established some plaques of ten incarnation of god Bishnu at those temples' bodies as a part of elegance. Some of those ten incarnations we can find at upper portion of some temples, somewhere two sides of temples and somewhere along with other mythological gods. We can see these ten incarnations together at very few temples. Whenever any violation, injustice and disaster come down then the universe rarer god Vishnu had born in the Avatars different incarnations to rescue and giving contentment to the earth inhabitants from those ultimate and terrible situations.

Keywords: Temple, Terracotta, Architecture, Mythology, Motif, Plaque, Decoration

১. ভূমিকা: বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের গাত্র অলংকরণে আমরা পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিবিধ চিত্র ফলককে প্রতিস্থাপিত হতে দেখি। এই সমস্ত কাহিনি চিত্রগুলি শুধু মাত্র মন্দিরের নান্দনিক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রতিস্থাপিত করা হয়নি, এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও মূল্য রয়েছে। বাংলার প্রায় প্রতিটি মন্দিরের অলংকরণে পৌরাণিক আখ্যানের কাহিনির-চিত্র এক বিরাট মাত্রায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলার টেরাকোটা মন্দির গাত্রের অলংকরণে পৌরাণিক যে সমস্ত কাহিনি গাথাগুলি স্থান করে নিয়েছে সেগুলি হল—রামায়ণের কাহিনি, মাহাভারতের কাহিনি, কৃষ্ণলীলার কাহিনি এবং অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর আখ্যান ও চিত্র ফলক ইত্যাদি। বর্তমান আমাদের গবেষণা প্রবন্ধের বিষয় হল—বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও দশাবতার। শষ্য শ্যামল ও নদী মাতৃক বাংলায় আমরা নানান রীতির মন্দির দেখতে পাই। এইসব রীতির মন্দিরের গাত্রালংকারে প্রতিস্থাপিত হয়েছে বিষ্ণুর দশাবতারের-চিত্র ফলক। কোথাও বা মন্দিরের উপরের অংশে, কোথাও বা

মন্দিরের দুই পার্শ্বে, আবার কোন কোন মন্দিরে অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীদের সঙ্গে দশাবতারের কয়েকটি অবতার স্থান পেয়েছে আবির্ভাব ঘটেছে। খুব কম মন্দিরেই আমরা একসাথে দশটি অবতারকে দেখতে পাই। এই পৃথিবীতে যখনই কোন অনাচার, অবিচার ও বিপর্যয় নেমে এসেছে তখনই জগৎপালক ভগবান বিষ্ণু এক একটা অবতার রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সেই চরম ও ভয়াবহ অবস্থা থেকে পৃথিবীবাসীকে মুক্তি ও স্বস্তি দিয়েছে।

২. দশাবতার: ভগবান ব্রহ্মাই হলেন এই জগতের সৃষ্টি কর্তা। আমাদের আদি পুরুষ মনুকে সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা। মনু কঠোর তপস্যা করে ও সাধনা করে এই পৃথিবীকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। ভগবান ব্রহ্মার আর্শীবাদে এবং মনুর তপস্যা, বাৎসল্যে এই জগৎ সংসার ভালোই চলছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ভালো সময়ের মধ্যেই হঠাৎ বিপর্জয় নেমে এল। কিছু অসাধু স্বার্থপর লোকেরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই জগৎ সংসারে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে থাকলো। এই অবস্থা এক সময় চরমে ওঠে এবং তখনই এই পৃথিবীতে এক চরম বিপর্যয় নামে। এই চরম অবস্থা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত এবং জগৎবাসীকে আশ্বস্ত করতে ভগবান বিষ্ণু এক এক রূপে এক এক অবতারে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন। ভগবান বিষ্ণুর এই দশটি অবতার হল—**মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ বা নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি।**

৩. দশাবতার কাহিনি: পৃথিবীতে যখনই অনাচার ও অবিচার শুরু হয়েছে তখনই জগৎপালক ভগবান বিষ্ণু অবতার রূপে এসে জগৎবাসীকে মুক্তি দিয়েছেন। বিভিন্ন পুরাণ এবং প্রাচীন গ্রন্থে আমরা বিষ্ণুর দশটি অবতারের উল্লেখ পাই। নিম্নে এই দশাবতারের কাহিনি সম্পর্কে আলোচনা করা হল[১]:

৩.১ মৎসাবতার: সমস্ত মানবকুলের আদি পুরুষ হলেন মনু মহারাজ মনুর রাজত্বকালের শেষ দিকে অনাচারে এই পৃথিবী ভরে যায়। ঠিক এই সময়ই একটা যুগের শেষ হয়। কৃতমালা নামক একটি নদীতে মহারাজা মনু একদিন স্নান করতে গিয়েছিলেন। স্নান সেরে তর্পণ করার জন্য তিনি তাঁর দুহাত দিয়ে নদী থেকে জল তুলে নিয়েছিলেন। সেই জলেই তাঁর হাতে উঠে এসেছিল ছোট্ট একটি মাছ। মাছটাকে তিনি জলে ছাড়তে যাবেন ঠিক সেই মূহুর্তেই মাছটি মনুকে বলে উঠল—দয়া করে আমাকে জলে ছেড়ে দেবেন না বাঁচান। সহৃদয় মনু তখন নিজের কমুণ্ডুলুর মধ্যে মাছটিকে রেখে তর্পণ সেরে নিজের প্রাসাদে ফিরলেন এবং প্রাসাদের একটা নিরালা জায়গায় কমুণ্ডুলুটা রেখে দিলেন।

পরদিন মহারাজা দেখলেন কমুণ্ডুলুর মধ্যে মাছটার আর জায়গা হচ্ছে না, মাছটা বড়ো হয়ে গেছে, তখন মনুর নির্দেশে এবং মাছের অনুরোধে মাছটাকে একটা চৌবাচ্চার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু পরদিন দেখা গেল মাছটা আরো বড়ো হয়ে গেছে এবং চৌবাচ্চার মধ্যেও তার জায়গা হচ্ছে না। তখন রাজা নিজের বাগানের সরোবরে মাছটিকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু পরের দিন আবার সেই বিপত্তি। মাছটি আরো বড়ো হয়ে উঠেছে এবং সরোবরেও তার জায়গা হচ্ছে না। তখন রাজা লোক লস্কর সহযোগে মাছটিকে সরোবর থেকে তুলে নদীতে ছেড়ে দিল। কিন্তু পরের দিন আবার সেই একই বিপত্তি। মাছটি এতো বড়ো হয়ে গেছে যে নদীতে আড়াআড়িভাবে মাছটি রয়েছে। নদীর সাধ্য কি তাকে ডিঙিয়ে যায়। তখন রাজার নির্দেশে মাছটিকে নদী থেকে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে আসা হল। সমুদ্রে ছাড়া মাত্রই মাছটি আরো বিশালাকার হয়ে উঠল। তখন মহারাজা বুঝতে পারলেন এই মাছ কোন সাধারণ মাছ নয়, নিশ্চয়ই ভগবান তার সাথে ছলনা করছেন। তখন মনু দুই হাত জোড় করে মাছটির সামনে কাতর স্বরে বললেন দয়া করে আপনি আমার পরিচয় প্রদান করুণ। তখন জগৎপালক নারায়ণ মাছের রূপ ত্যাগ করে সমুদ্রের জল থেকে উঠে মনুর সামনে উপস্থিত হল।

মাছ রূপী ভগবান বিষ্ণু রাজাকে বললেন আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় হবে এবং সমস্ত বিশ্ব জলের তলায় চলে যাবে। মানুষ থেকে শুরু করে শষ্যবীজ সমস্ত কিছুই সংগ্রহ করে রাখবে। প্রলয়ে যখন সমস্ত কিছু তলিয়ে যেতে থাকবে তখন একটা নৌকা তুমি দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে বিষ্ণুর সোনার সিংও দেখতে পাওয়া যাবে। দড়ি দিয়ে সেই সিং এর সঙ্গে নৌকাকে বেঁধে রাখবে। তারপর সমুদ্রের জল যখন সরে গিয়ে আবার মাটি দেখা যাবে তখন তুমি এই পৃথিবীকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তুলবে। সপ্তর্ষিরা এই কাজে মনুকে সাহায্য করবে। এই কথাগুলি মনুকে বলে মাছটি আবার সমুদ্রের জলের মধ্যে হারিয়ে গেল। এরপর সাতদিনের মধ্যে সেই সব ঘটনা ঘটল যা যা বলেছিলেন মৎস্য রূপী বিষ্ণু অবতার। রাজা বিষ্ণুর আদেশ মতো সেই সব কাজ করলেন এবং সপ্তর্ষিদের সাহায্যে পৃথিবীকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তুললেন। আর এইভাবেই আর একটি নতুন যুগের সৃষ্টি হল **(চিত্র নং-১, ২ও ৩)**।

চিত্র নং: ১- মৎস্য অবতার

চিত্র নং: ২- মৎস্য অবতার

চিত্র নং: ৩- মৎস্য অবতার

৩.২ কূর্মাবতার: আমরা জানি স্বর্গের দেবতারা ভোগবিলাসী। এমন এক সময় এসেছিল এই ভোগবিলাসী দেবতারা বিলাসের মধ্যে থাকতে থাকতে তাদের সাধনা, তপস্যার কথা ভুলে গিয়ে ক্রমশই দূর্বল হয়ে উঠেছিল। তখনই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কলহ বিবাদের সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে পাতালে বসবাসকারী দৈত্যরা কৃচ্ছসাধন, ধ্যান, শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্রের অনুশীলন প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদেরকে আরো উন্নত করতে থাকে। ঠিক এই সময়ই অসুররা স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে বসে এবং দেবতাদের বিপদের মুখে ফেলে দেয়। অসুরদের আক্রমণে দেবতারা পারাজিত হয় এবং স্বর্গরাজ্য থেকে তারা প্রাণ বাঁচিয়ে পালায়, আর স্বর্গরাজ্যে অসুরদের শাসন কার্য চলতে থাকে। স্বর্গ চ্যুত হয়ে দেবতারা উদ্ধারের জন্য প্রথমে ব্রহ্মার স্মরণাপন্ন হয়। এরপর ব্রহ্মার পরামর্শে ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেবতারা বিষ্ণুর কাছে যায় এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য। বিষ্ণু তখন দেবতাদের পরামর্শ দেয় ক্ষীরসাগর মন্থন করে অমৃত পান করে পুনরায় শান্তি অর্জন করতে।

তখন দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একটা সন্ধি সাক্ষরিত হয় এবং উভয় পক্ষ মিলেই ক্ষীরসাগর মন্থনের কার্যে ব্রতী হল। কিন্তু মন্থনের জন্য চাই দণ্ড ও দড়ি। নারায়ণের ইচ্ছায় মন্দার পর্বত হল দণ্ড আর নাগরাজ বাসুকি হল দড়ি। এই মন্থনের সময় আবার এক বিপর্যয় ঘটল। জলের মধ্যে মন্দার পর্বত বারবার ঘুরতে ঘুরতে পাঁকের ভেতরে তলিয়ে যেতে থাকল। বিশ্বকর্মার মতো বড়ো কুশীলবেরাও কোন ভাবে পাহাড় ভাসিয়ে রাখতে পারল না। এই চরম পরিস্থিতেতে দেবতারা আবার বিষ্ণুর স্মরণাপন্ন হলেন। তখন ভগবান বিষ্ণু বিশাল এক কচ্ছপের রূপ ধরে জলের তলায় গিয়ে তাঁর পিঠের ওপর মন্দার পর্বতকে এমনভাবে তুলে ধরলেন যাতে আর কিছুতেই পাঁকের ভেতর তলিয়ে যেতে না পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান বিষ্ণু কচ্ছপ বা কূর্ম রূপে সাহায্য করেছিলেন বলেই, বিষ্ণুর আর এক অবতার হল কূর্ম।

এরপর মন্থনে আর কোন বাধা এল না। মন্থনের পর একে একে উঠতে থাকল সুরভি গাই, উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়া, সুন্দর সুন্দর লোভনীয় জিনিস, অপরূপা লক্ষী দেবী এবং অবশেষে অপরূপ এক পুরূষ হাতে অমৃত কলস নিয়ে উঠে এল। দেবতারা এই পুরূষের নাম দিলেন 'ধন্বন্তরি'; এরপর দেবতা ও অসুরদের মধ্যে অমৃত পান করা নিয়ে কলহের সৃষ্টি হল, ভগবান বিষ্ণুর সহায়তায় সেই কলহের অবসান হল। দেবতারা কৌশল করে সেই অমৃত পান করে নিল অসুরেরা পেল না। ফলে দেবতাদের সাথে অসুরদের আবার যুদ্ধ বাধল এবং সেই যুদ্ধে অসুররা হেরে গেল। পুনরায় স্বর্গ রাজ্যে দেবতাদের ক্ষমতা কায়েম হল **(চিত্র নং-৪, ৫ও ৬)**।

চিত্র নং: ৪- কূর্ম অবতার

চিত্র নং: ৫- কূর্ম অবতার

চিত্র নং: ৬- কূর্ম অবতার

৩.৩ **বরাহ অবতার:** মহারাণী দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ্য ছিলেন মহা বলবান ও শক্তিধর। যুদ্ধই ছিল হিরণ্যাক্ষের নেশা; তার গায়েও ছিল অসীম শক্তি। এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে হিরণ্যাক্ষ্য একের পর এক স্থান দখল করতে থাকে দেবতাদের পিছনে ফেলে। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা আর মহেশ্বর ছাড়া আর কাউকেই সে সহ্য করতে পারত না। এমন কি ভগবান বিষ্ণুর নাম কেউ উচ্চারণ করলে তাকে মেরে ফেলত।

হিরণ্যাক্ষ তপস্যা করে ব্রহ্মার অমরত্বের বর চাইলেন কিন্তু ব্রহ্মা তাকে এই বলে বর দিলেন যে কোন অস্ত্র শস্ত্রের আঘাতে তার মৃত্যু হবে না। এরপর থেকে হিরণ্যাক্ষ্য একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠল, তার অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গ রাজ্য থেকে পালাতে আরম্ভ করল। ঠিক এই সময়ই পৃথিবীতে এক বিপর্জয়ের সৃষ্টি হল। আমরা জানি সূর্য সুমেরু (উত্তর) মেরু প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণের সময় সূর্যের যাতে কোন অসুবিধে না হয় তাই পৃথিবীর সুমেরুর মাথাটা ডানদিকে একটু হেলিয়ে দিত, হঠাৎ একদিন সুমেরুর মাথাটা একটু বেশি হেলে যাওয়াই সাগর মহাসাগরে প্লাবনের সৃষ্টি হয় এবং গোটা বিশ্ব জলময় হয়ে ওঠে। এর ফলে মহা প্রলয়ের সৃষ্টি হয়, সমস্ত মানুষ, পশু পাখি, গাছ পালা সবই মারা যায়। শুধুমাত্র থেকে যায় কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া এবং হিমালয়।

এই পরিস্থিতিতে হিরণ্যাক্ষ্য যুদ্ধ করার জন্য আর কাউকে পেল না। তখন হিমালয়ের চূড়ায় আঘাত করতে থাকল। তখন হিমালয়ের অধিষ্ঠিত দেবতা বেরিয়ে এসে বলল তুমি বরূণদেবের সাথে যুদ্ধ করো। হিরণ্যাক্ষ্য বরূণদেবের কাছে যুদ্ধ করতে গেলে বরুণদেব তাকে শ্রীহরির সাথে যুদ্ধ করার কথা বলে। এই সময় বিষ্ণু ছিলেন পাতালে। জলের তলা থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে আনার জন্য বিষ্ণু বিরাট আকার এক বরাহের (শূকরের) রূপ ধরে তাঁর বিশালাকার দাঁত দিয়ে পৃথিবীকে তুলে আনার চেষ্টা করছিলেন। হিরণ্যাক্ষ্য পাতালে গিয়ে বরাহের বিশালাকার চেহারা, আগুনের মতো চোখ আর খাড়া দাঁত দেখে প্রথমে অবাকই হয়ে গেলেন। বরাহের সাথে যুদ্ধে হিরণ্যাক্ষ্য লিপ্ত হল। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় দুজনের হাতিয়ারই মাটিতে পড়ে গেল। এরপর মুখোমুখি লড়াই শুরু হল দুজনের মধ্যে। বরাহ রূপী বিষ্ণু তার খাড়ার মতো দাঁত হিরণ্যাক্ষ্যের শরীরে ঢুকিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে তাকে হত্যা করলেন এবং তার অত্যাচারের হাত থেকে জগৎবাসীকে চিরকালের জন্য মুক্তি দিলেন।

৩.৪ **নৃসিংহ অবতার:** মহারাণী দিতির আর এক পুত্র অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষ্যের ছোট ভাই হিরণ্যাকশিপু ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা হিরণ্যাক্ষ্যের মৃত্যুর খবর শুনে রাগে একেবারে ফেটে পড়ল। হিরণ্যকশিপুও অমরত্ব লাভের জন্য ব্রহ্মার তপস্যা করতে লাগল। সে ব্রহ্মার কাছে বর চাইল কোন অস্ত্রের আঘাতে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি হওয়া কারোর দ্বারা জল-স্থল-শূণ্য ও আগুনে এবং দিনে বা রাতে তার যেন মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মাও তাকে এই বর প্রদান করলেন।

এরপর রাজধানীতে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার বেড়ে যেতে থাকল। দেবতাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে সে স্বর্গ রাজ্য জয় করে নিল। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের আধিশ্বর হয়ে বসল হিরণ্যকশিপু। ইতিমধ্যেই হিরণ্যকশিপুর পুত্র জন্মাল যার নাম প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে গুরু শুক্রাচার্যের কাছে শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠিয়ে দিল। কিন্তু প্রহ্লাদ গুরুগৃহে গিয়ে সুযোগ পেলেই শ্রীহরির গুণকীর্তণ করতে থাকে। শত বোঝানোর পরেও কিন্তু প্রহ্লাদকে বাগে আনতে পারা গেল না। এদিকে হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে মারার জন্য বিভিন্ন চেষ্টা করল কখনও বা হাড়িকাঠে মাথা রেখে তাকে তাকে হত্যা করতে গেল, কখনো শূলে চড়ানোর চেষ্টা করল, আবার কখনও মাতাল হাতির পায়ের তলায় তাকে ফেলে দিল, কখনও বা বুকে পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল, আবার কখনও তাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু শ্রীহরির কৃপায় প্রতিবারই সে বেঁচে গেল। তখন হিরণ্যকশিপু রেগে গিয়ে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করল—'তোর শ্রীহরি কোথায় থাকে', প্রহ্লাদ জবাব দিল 'শ্রীহরি সব জায়গাতেই থাকে'। রেগে তখন হিরণ্যকশিপু একটা থামের মধ্যে লাথি মারল, সেই থাম থেকে সিংহের মতো বিরাটাকার এক প্রাণী গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এল। এই প্রাণীর মুখটা সিংহের মতো এবং বাকিটা মানুষের মতো। তার হাতের আঙুলের নখ খুড়ের মতো ধারালো ও শক্ত। এই সিংহের সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর যুদ্ধ বেঁধে গেল। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় এই বিরাটাকার নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে তার উরূর মধ্যে তুলে নিয়ে নখ দিয়ে তার বুক চিরে দুফালা করে দিল এবং হিরণ্যকশিপু প্রাণ ত্যাগ করল। এইভাবেই ভগবান বিষ্ণু নরসিংহের রূপ ধরে এসে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে জগৎবাসীকে তার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে গেল। তাই নরসিংহকেও ভগবান বিষ্ণুর আর এক অবতার রূপে গণ্য করা হয় **(চিত্র নং-৭, ৮ ও ৯)**।

চিত্র নং: ৭- নৃসিংহ অবতার

চিত্র নং: ৮- নৃসিংহ অবতার

চিত্র নং: ৯- নৃসিংহ অবতার

৩. বামন অবতার: হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে নরসিংহ অবতার অর্থাৎ শ্রীহরি প্রহ্লাদকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন, প্রহ্লাদ কিছুকাল সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাজত্ব করার পর তাঁর পুত্র বিরোচনের হাতে এই দ্বায়িত্বভার তুলে দিলেন। কিন্তু কৌশল করে দেবতারা বিরোচনের আয়ু কেড়ে নিলেন। এরপর সিংহাসনে বসলো বিরোচনের পুত্র বলি। রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে বলি সবসময়ই দাদু প্রহ্লাদের পরামর্শ নিয়েই চলত। একবার দেবতাদের সাথে বলির প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বলি হেরে যায়। এরপর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পরামর্শে বলি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে আবার যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে। এরপর বলি আবার স্বর্গরাজ্যে আক্রমণ করে দেবতাদের সহজেই হারিয়ে সিংহাসনে বসে পড়ে। স্বর্গের সিংহাসনে বসে বলি "কল্পতরু" হয়ে যায় এবং যে যা চাইবে তাই দেবে বলে মনস্থির করে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশে বলি নর্মদা নদীর তীরে ভৃগুকচ্ছ নামে এক জায়গায় দান যজ্ঞ করছিলেন।

এদিকে এ সময়ে নারায়ণের বরদানে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন ভগবান বিষ্ণু। অদিতির এই সন্তান অল্প বয়সেই বেদের এবং শাস্ত্রের স্ত্রোত্রগুলো এমনভাবে বলত যা শুনে সবাই অবাক হয়ে যেত। আস্তে আস্তে সময় কাটতে লাগল কিন্তু অদিতির এই সন্তানের জ্ঞান বুদ্ধি বাড়লেও শরীরের বাড় বাড়ন্ত হল না। তাই সকলে অদিতির এই পুত্রকে বামন বলে ডাকত। বামন রূপী শ্রীবিষ্ণু একবার বলির দানযজ্ঞ কর্মশালায় গিয়ে বেদের শ্রুতি ও রাজার গুণগান গাইলেন। এই শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বুঝতে পারলেন এই বালক আসলে কে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিকে এই বালককে কিছু না দেওয়ার জন্য বলে দিলেন। বামন বলল তার নিজের জন্য কিছু চাই না তার গুরুদেবের যজ্ঞ করার জন্য পায়ের মাপের তিনপা জায়গা প্রয়োজন। বলি গুরুদেবের নির্দেশ অমান্য করে বামনকে তিনপা জমি দিতে সম্মত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে বামনও বিরাটাকার রূপ ধারণ করে এক পা স্বর্গ লোকে ফেললেন, আর এক পা ভূঃলোকে ফেললেন এবং তৃতীয় পা কোথায় ফেলবেন তা বলিকে জিজ্ঞাসা করলেন। বলি তখন কোন উপায় না পেয়ে দাদু প্রহ্লাদকে স্মরণ করলেন। প্রহ্লাদ এসে তার প্রভুর এই বিশ্বরূপ দর্শন করে বিভোর হয়ে গেল। প্রহ্লাদ ভগবান বিষ্ণুর তৃতীয় পা টি বলির মাথায় রেখে তার মন থেকে সমস্ত অহংকার মুছে দেবার জন্য বললেন। বামনদেবও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তৃতীয় পা টি বলির মাথায় রেখে তার মন থেকে সমস্ত অহংকার মুছে দিয়ে তাকে পাতালে পাঠিয়ে দিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে বামন দেব বললেন বলি পাতালে ইন্দ্রের মতো রাজত্ব করবে আর তাঁর দ্বারে রক্ষি হয়ে থাকবেন স্বয়ং বামন দেব **(চিত্র নং-১০ ও ১১)**।

চিত্র নং: ১০- বামন অবতার

চিত্র নং: ১১- বামন অবতার

৩.৬. পরশুরাম অবতার: ঋষি জমদগ্নি ও তার পত্নী রেনুকার চার ছেলে তার মধ্যে রাম ছিল সবার ছোট। এই সময় সমস্ত পৃথিবী চালানোর ভার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ছিল। কিন্তু এমন সময় এসেছিল যখন ক্ষত্রিয়দের মন দম্ভ ও অহংকারে ভরে

গিয়েছিল এবং তারা নিজেদের সর্বেসর্বা ভাবছিল, আর তারা সেইভাবে কাউকে পাত্তা দিচ্ছিল না। আর ঠিক সেই সময়ই রামের আবির্ভাব ঘটে। রামের হাতে সব সময়ই পরশু অর্থাৎ কুঠার বা কুড়ুল থাকত, তাই তিনি সকলের কাছে পরশুরাম নামে পরিচিত ছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই রাম ছিল ডানপিটে, লেখাপড়াতেও তার যথেষ্ট মন ছিল। শিবের কাছে তপস্যা করে রাম দুটো বর চেয়েছিলেন, এক- ইচ্ছামৃত্যু, দুই- যতক্ষণ তার হাতে কুঠার থাকবে ততক্ষণ তাকে কেউ হারাতে পারবে না। কোন কারণে রেনুকার ওপর ঋষি জমদগ্নি খুব রেগে যায়। তখন এক এক করে বড়ো, মেজ ও সেজ ছেলেকে মায়ের মাথা কেটে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় সেই নির্দেশ মানতে সবাই অসম্মত হলে পিতৃশাপে তারা জ্ঞান হারায়। অবশেষে রাম সেই আদেশ মানে এবং কুঠার দিয়ে মায়ার মাথা কেটে দেয়। জমদগ্নি খুশি হয়ে রামকে বর দিতে চাইলে রাম বাবার কাছে চারটে বর চেয়ে নেয়—এক, মা বেঁচে উঠুক এবং তার মৃত্যুর কথা যেন মা জানতে না পারে, দুই, দাদারা জ্ঞান ফিরে সুস্থ হয়ে উঠুক এবং এই ঘটনার কথা যাতে তাদের যেন মনে না থাকে, তিন, কেউ যেন যুদ্ধে তাকে হারাতে না পারে, চার, রাম যেন দীর্ঘজীবন দান করতে পারে। জমদগ্নি ছেলের সব প্রার্থনা মঞ্জুর করে দেয়।

এরপর একদিন কীর্তিবীর্যের ছেলে অর্জুন জমদগ্নির তপোবনে শিকার করতে এল। জমদগ্নির কামধেনু নামক একটি গাই ছিল, তার কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত। অর্জুনের গাইটির প্রতি খুব লোভ হয় এবং ঋষির কাছে গাইটি চেয়ে বসে ঋষি দিতে অসম্মত হলে অর্জুন যুদ্ধ শুরূ করে তখন ঋষি গাইটির সামনে বলে—এই অবস্থা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো, তখন গাইটির সাহায্যে হাজার সৈন্য সামন্ত এসে অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করে তাকে তপোবন থেকে তাড়িয়ে দেয়।

এই কথাটা রামের কানে গেলে গেলে সে অর্জুনের রাজধানী অর্থাৎ মহিস্মতী নগরে গিয়ে তছনছ করে এই ক্ষত্রিয় বীরকেও হত্যা করলেন। এরপর অর্জুনের ছেলেরা তপোবনে এসে জমদগ্নিকেও হত্যা করে বসল। এইসব দেখে রাম কুঠার হাতে প্রতিজ্ঞা করল পৃথিবী থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের মেরে ফেলে ক্ষত্রিয় শূণ্য পৃথিবী গড়ে তুলবে। এইভাবে সারা পৃথিবী একসময় ক্ষত্রিয় শূণ্য হয়ে পড়ল শুধুমাত্র কয়েকজন রমণী প্রানভয়ে গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে বসেছিল। অনেক কষ্ট করে ব্রাহ্মাণরা রামকে শান্ত করলে এরপর ভারত সাগরে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে রাম তপস্যায় বসলো। ঋষিরা সেই ক্ষত্রিয় রমণীদের উদ্ধার করে এনে তাদের ছেলেপুলেদের সুশিক্ষা দিয়ে আবার নতুন করে শাস্ত্র মতে শাসন ব্যবস্থা চালু করলেন **(চিত্র নং-১২)**।

চিত্র নং: ১২- পরশুরাম অবতার

৩.৭. শ্রীরামচন্দ্র: অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র ছিলেন রাম। পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য চোদ্দ বছর স্ত্রী সীতা এবং ছোট ভাই লক্ষণের সঙ্গে বনবাস জীবন কাটিয়েছেন। বনবাস কালে লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে চলে যায়। ব্যাকুল রাম ও লক্ষণ সীতার খোঁজ করতে করতে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় হনুমান রাজ বালির। বালি এবং তার হনুমান সেনার সহায়তায় সমুদ্র পথ অতিক্রম করে রাবণের সাথে যুদ্ধ করে তাকে হারিয়ে সীতাকে উদ্ধার করেন শ্রীরামচন্দ্র, যার ব্যাখা আমরা রাময়ণ মহাকাব্যে আমরা পায়। রামচন্দ্রের দৈব্য বলে রাক্ষস রাজ রাবণ ও রাক্ষস সেনাদের হারিয়ে লঙ্কা বিজয়ের কাহিনি মর্ত্য মানবে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এইসব কারণেই রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর আর এক অবতার বলে মানা হয় **(চিত্র নং-১৩, ১৪ ও ১৫)**।

চিত্র নং: ১৩- রাম অবতার

চিত্র নং: ১৪- রাম অবতার

চিত্র নং: ১৫- রাম রাবণের যুদ্ধ

৩.৮ বলরাম বা বলদেব: হলধারী বলরাম হলেন কৃষ্ণের অগ্রজ। বলরামকে বিষ্ণুর আর এক অবতার রূপেই কল্পনা করা হয়। প্রলম্ব নামক দৈত্যকে বধ করে বলরাম প্রলম্বন নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। কৃষ্ণর সঙ্গে তিনিও হংস রাজার সঙ্গে আঠারো দিন ব্যাপী যুদ্ধ করে জয় লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমার পাশে তার জনপ্রিয়তা এই সংসারে অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে **(চিত্র নং- ১৬ ও ১৭)**।

চিত্র নং: ১৬- কৃষ্ণ

চিত্র নং: ১৭- কৃষ্ণলীলা

৩.৯ বুদ্ধ অবতার: যেদিন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সেই দিন থেকেই দেবতা ও অসুরদের মধ্যে কলহ লেগেই থাকত ক্ষমতা দখলের লড়াই নিয়ে। আর বাহুবলে অসুররা দেবতাদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। বার বার অসুরদের কাছে হেরে গিয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে দেবতারা একদিন ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন প্রতিকারের আশায়। তখন ভগবান বিষ্ণু বললেন তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা করো, আমি শুদ্ধধনের পুত্র হয়ে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করবো, আমার নাম হবে বুদ্ধ। এই পৃথিবীতে আমি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করবো। যার সঙ্গে বেদের কোন সম্পর্ক থাকবে না, দৈত্য দানবেরা এই ধর্মের মায়ায় পড়ে কোন খারাপ কাজ করতে পারবে না।

অবশেষে দেবতাদের এই প্রতিক্ষার অবসান হল কপিলাবস্তু নগরে রাজা শুদ্ধধনের এক পুত্র জন্মাল, যার নাম সিদ্ধার্থ। মুনি ঋষিরা এই ছেলেকে দেখে বললেন ‘এই ছেলে নয় রাজা হবে নয় সন্ন্যাসী হবে’। দিন দিন সিদ্ধার্থ বড়ো হতে থাকল। সর্বজীবের প্রতি সিদ্ধার্থের অসীম দয়া। একদিন গোপা নামক একটি মেয়ের সাথে সিদ্ধার্থের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু সংসারে তার মন নেয়। রথে চেপে ভ্রমণে বের হয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন কয়েকজন মিলে একটা মৃতদেহকে শ্মশানের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তার আত্মীয় স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। রোগ শোক জরা ব্যাধি মৃত্যু এইসব নিয়েই জীবন—এটা সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করতে পারলেন। সিদ্ধার্থ তখন স্থির করল যে সন্ন্যাসী হবেন এবং ব্যাধি ও মৃত্যুকে জয় করবেন। শুদ্ধধন সিদ্ধার্থকে আটকানোর জন্য পাহইরা বসালো। ইতিমধ্যেই সিদ্ধার্থের রাহুল নামে একটি ছেলে হল। তখন সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল এখনই সংসারের মায়া কাটাতে না পারলে আর কোনদিনই কাটানো যাবে না। এই ভেবে একদিন গভীর রাতে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করল, সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য।

এরপর নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে সিদ্ধার্থ সিদ্ধি লাভ করল কিন্তু তার মনে কিছুতেই শান্তি এল না কারণ জরা ও মরণের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তখনও জানতে পারেনি সিদ্ধার্থ। এর জন্য সিদ্ধার্থ গয়ার কাছে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরূবিল্ব গ্রামে গভীর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তারপর ধ্যান করতে করতে মুক্তি পথের নির্বাণ লাভের সন্ধান পেয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। সেই থেকে সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী।

এরপর কাশী থেকে সারনাথ এলেন বুদ্ধ, সেখানে পাঁচজন শিষ্যকে বেছে নিয়ে সত্য প্রচারের দ্বায়িত্ব দিলেন। অশান্তির মধ্যে শান্তিপথের সন্ধান পেয়ে দলে দলে মানুষেরা তার কাছে আসতে থাকল। পিতা শুদ্ধধনের অনুরোধে বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে এল। স্ত্রী গোপা ও পুত্র রাহুলও তাঁর অনুগামী হল। এইভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ মত।

৩.১০ কল্কি অবতার: বুদ্ধদেবের মহানির্বাণ লাভের কিছু কাল পর থেকে মানুষ আবার স্বার্থপর হয়ে উঠল। বুদ্ধদেবের নীতি আর্দশ সব ভুলে গিয়ে মানুষ আবার কলহ ও বিবাদে লিপ্ত হয়ে উঠল। এই যুগে এইসব দলাদলি, হিংসা, বিবাদ, বিদ্বেষ প্রভৃতি থেকে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীতে অরাজকতার বন্যা বয়ে যেতে লাগল।

মানুষ কে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে ভগবান বিষ্ণু আবার জন্মগ্রহণ করবেন কল্কি অবতার রূপে। কল্কি শম্ভল নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে, যশোমতি নামক এক ধর্মপরায়ণা নারীর গর্ভে। যুব অল্প বয়সেই কল্কি বেদ অধ্যয়ণ করে হয়ে উঠবে সুপণ্ডিত এবং মহাদেবের আর্শীবাদে অস্ত্র শিক্ষাতেও হয়ে উঠবে পারদর্শী। সিঙ্ঘল কন্যা পদ্মাবতীর সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবে। কল্কি এমন এক সময় আসবে যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য দিগ্বিজয়ে বার হবে। তখন অনাচারী মানুষেরা কল্কির গতিকে রূদ্ধ করার চেষ্টা করবে তবুও তারা কল্কিকে প্রতিহত করতে পারবে না।

কল্কি তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এই পৃথিবীকে সুন্দর ও শষ্য শ্যামল করে তুলবে। এমন সময় আসবে যখন কলি যুগ ধ্বংস হয়ে সত্য যুগের সূচনা হবে। আর এই দেখেই কল্কি দেব তথা ভগবান বিষ্ণু আবার স্বর্গধামে ফিরে যাবেন।

৪. বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও দশাবতার: ইঁটের তৈরি বাংলার মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক কাহিনি যুক্ত দৃশ্য ফলকগুলি সর্বাধিক মাত্রায় স্থান করে নিয়েছে। আবার এই পৌরাণিক কাহিনি ও দশাবতার দৃশ্য ফলক বাংলার মন্দির গাত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলার বেশিরভাগ মন্দিরের গাত্রালংকারে আমরা বিষ্ণুর এই দশাবতারের ফলক প্রতিস্থাপিত হতে দেখি। কোনো মন্দিরে দশাবতারকে একসাথে দেখা যায় আবার কোন কোন মন্দিরে অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর ফলকের সাথে দশাবতারের ফলক দেখা যায়। দশাবতারের ফলকগুলি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের ওপরের অংশে চৌকোণা ফলকে বা মন্দিরের দুই পার্শ্বে বা মন্দিরের পার্শ্বের দেওয়ালের অংশে এক একটা বড়ো আকারের ফলকে স্থান করে নিয়েছে। বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে দশাবতারের কাহিনি চিত্র প্রতিস্থাপন সম্পর্কে 'বাংলার মন্দির শিল্প শৈলী (অন্ত মধ্য যুগ), নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে: ***"অন্ত্য মধ্যযুগের ইটের মন্দিরগুলিতে টেরাকোটাবিহীন অলংকরণ খুব কমই দেখা গেছে আবার টেরাকোটা অলংকরণে কোনো একজন অবতার উপস্থিত হননি এটাও বিরল ঘটনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, স্থানীয় বিশ্বাস রীতি আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী এই দশাবতার কল্পনায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে-যেমন, বলরামের জায়গা নিয়েছেন কৃষ্ণ, বুদ্ধের বদলে অবতারত্ব লাভ করেছেন জগন্নাথ (উড়িষ্যা ও বাংলা অঞ্চলে), আবার কখনও চৈতণ্যদেব অবতার হিসাবে বুদ্ধের স্থান দখল করেছেন (বাংলা)। কখনও দেখা যায় পশু অবয়বেই মৎস্য, বরাহ, কূর্ম অবতার পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নর ও পশুর সমন্বায়িত রূপ এই অবতার প্রতিমূর্তিগুলি চিত্রিত হয়েছে—যেখানে দেহের উপরের অংশে দুই হাত বিশিষ্ট মনুষ্য আকৃতি বা চর্তুহস্ত বিষ্ণু মূর্তি দেখা যায়। মানুষ ও সিংহের একত্রিত রূপ নৃসিংহ অবতার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী অশুভ শক্তির বিনাশকারী রূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছেন। আবার বামন অবতারে বিষ্ণু উপস্থাপিত হয়েছেন কখনও একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ বালক রূপে আবার কখনও একটি পদ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত অবস্থায় বিশাল মূর্তিতে বামন অবতার উৎকীর্ণ হয়েছে"।*** [২]

বিষ্ণুর এই দশাবতারের উল্লেখ আমরা গীতা, ভাগবত, মহাভারত, বিষ্ণু পুরাণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থ ও পুরাণে পাওয়া যায়। ভাগবত সম্মতভাবে ধর্মাচারণের একটি বৈশিষ্ট্যই হল দশাবতারের উপাসনা। আর এই অবতারের উপাসনাই হল ভগবান বিষ্ণুর এক এক রূপে মর্ত্যে আর্বিভাব এবং মর্ত্যবাসীকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার ও মুক্তি দেওয়া। তাই এই বিষ্ণুর দশাবতারের কাহিনি বিভিন্ন সাহিত্য, পুরাণ, গ্রন্থ প্রভৃতিতে পেয়ে থাকি। টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম নয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রীতির টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে আমরা দশাবতারের চিত্র দেখতে পাই। অন্ত মধ্য যুগে বাংলার টেরাকোটার প্রায় সব মন্দিরগুলিতে দশাবতারের ফলক প্রতিস্থাপিত করা হয়নি এই রকম ঘটনা খুবই

বিরল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কোথাও বা দশাবতারদের একসাথে দেখা গেছে আবার কোথাও একসাথে দুটো বা তিনটে অবতার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে—স্থানভেদে বা অঞ্চলভেদে কোন কোন অবতারের রূপ পরিবর্তনও হয়েছে। যেমন—কৃষ্ণ বলরামের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে, বুদ্ধের জায়গায় জগন্নাথ বা চৈতন্য স্থান করে নিয়েছে। এর কারণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি- কৃষ্ণের জনপ্রিয়তার সামনে বলরাম ম্লান হয়ে গেছে। বাংলার বুদ্ধের থেকে চৈতন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বেশি। আর বাংলার পাশ্ববর্তী রাজ্য ওড়িষ্যায় Jaganath Cult বা জগন্নাথ সংস্কৃতি প্রভাব ওড়িষ্যার সংলগ্ন মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথ স্থান করে নিয়েছে আবার কখনও কখনও অবতারগুলিকে আমরা মানুষ ও পশুর মিশ্র রূপের মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত হতে দেখতে পাই, যেমন—মৎস্য, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ ইত্যাদি অবতার **(চিত্র নং-১৮ ও ১৯)**।

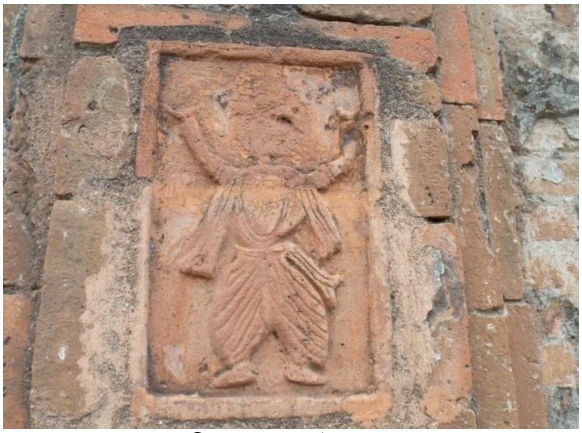

চিত্র নং: ১৮- চৈতন্য

চিত্র নং: ১৯- জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা

এবার নিম্নে আমরা দশাবতারের কাহিনিচিত্র সম্বলিত ফলকগুলি নিয়ে আলোচনা করবো:

১. বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া শহরের পাঠক পাড়ায় রাধা বল্লভ মন্দিরে পৌরাণিক দেব-দেবীর সাথে দশাবতারের ফলক দেখা যায়।

২. বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের একরত্ন, শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন, শ্রীধরের নবরত্ন, কেষ্টরায়ের জোড়বাংলা মন্দিরে দশাবতারের কয়েকটি ফলক দেখা যায়।

৩. মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার অযোধ্যা, রঘুনাথবাড়ির মন্দিরগুলিতে বুদ্ধ, জগন্নাথ, বলরাম, মৎস্য ইত্যাদির ফলক দেখা যায়।

৪. ঘাটালের আলুই গ্রামের দামোদরের নবরত্ন মন্দিরে দশাবতারের চিত্র ফলক রয়েছে।

৫. দাসপুরের খোরদা বিষ্ণুপুর গ্রামের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে আমরা দশাবতারের চিত্র ফলক দেখা যায়।

৬. ঘাটালের চাউলি গ্রামের আটচালা রীতির শিব মন্দিরে দশাবতারের চিত্র ফলক রয়েছে।

৭. হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রের একরত্ন রীতির মন্দিরে দশাবতারের কয়েকটি ফলক রয়েছে।

৮. বাঁশবেড়িয়ার অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে পৌরাণিক দেব দেবীদের সাথে দশাবতারের কয়েকটি ফলক রয়েছে।

৯. মুর্শিদাবাদের বড়নগরের চার বাংলা রীতির মন্দিরে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারের চিত্র ফলক প্রতিস্থাপিত রয়েছে।

১০. মুর্শিদাবাদের ভট্টবাটি গ্রামে রত্নেশ্বর শিব মন্দিরের দেওয়ালে বড় আকারের ফলকে মৎস্য, বামন ইত্যাদি অবতারের ফলক রয়েছে।

১১. বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামের কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে যে ফুলপাথরের চারচালা রীতির মন্দিরগুলি রয়েছে সেখানে দশাবতারের ফলক এবং অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীদের সাথে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারের ফলক প্রতিস্থাপিত রয়েছে।

১২. জয়দেব কেন্দুলীর রাধাবিনোদ মন্দিরে দশাবতারের কয়েকটি অবতারের চিত্র ফলক দেখা যায়।

১৩. দুবরাজপুরের ময়রাপাড়ার ত্রয়োদশরত্ন মন্দিরে দশাবতারের চিত্র ফলক প্রতিস্থাপিত হতে দেখা যায়।

১৪. নদীয়া জেলার রাণাঘাটের আট চালা রীতির জোড়া শিব মন্দিরে পৌরাণিক দেব দেবীর সাথে দশাবতারকে দেখা যায়।

১৫. শান্তিপুরের আটচালা রীতির মন্দিরটিতেও দশাবতারের চিত্র ফলক প্রতিস্থাপিত হয়েছে, ইত্যাদি।

৫. বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে দশাবতারের ফলকের আকার, অবস্থান, নকশা, মূর্তির ধরণ ও গঠন: বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের গাত্র অলংকরণে প্রতিস্থাপিত দশাবতারের চিত্র ফলকগুলি শুধুমাত্র আখ্যানগত দিক থেকে গুরূত্বপূর্ণ নয় মন্দিরের সৌন্দর্য বর্ধন ও নান্দনিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরূত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে, এবারে আমরা দশাবতারের ফলকের আকার, অবস্থান, নকশা, বিন্যাস, মূর্তির ধরণ ও গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করবো:

৫.১. ফলকের আকার: মন্দির গাত্রে প্রতিস্থাপিত দশাবতারের কাহিনি সম্বলিত বিভিন্ন আকারের ফলক আমরা দেখতে পাই, ছোট, বড়ো, মাঝারি আকারে ত্রিকোণা, লম্বা চৌকোণা, চ্যাপ্টা চৌকোণা আকারের ফলকে দশাবতারের কাহিনি চিত্র প্রতিস্থাপিত হতে আমরা দেখতে পাই। মুর্শিদাবাদের বড়োনগর, ভট্টবাটি বা বিষ্ণুপুরের শ্যামরাই মন্দির প্রভৃতি মন্দিরে Bas Relif এ ফলকগুলিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দশাবতারের ফলকগুলির মাপ সাধারণত হয়ে থাকে—১৬×১৪ ইঞ্চি, ১৫×১০ ইঞ্চি, ১০×১০ ইঞ্চি, ৮×১০ ইঞ্চি, ১০×৮×৬ ইঞ্চি, ১০×১০ ইঞ্চি, ৮×১০ ইঞ্চি, ১০×৮×৬ ইঞ্চি, ১০×১৫ ইঞ্চি, ৮×৬ ইঞ্চি, ৪×৫ ইঞ্চি, ৫×৫ ইঞ্চি, ৫×৫ ইঞ্চি, ৫×৪ ইঞ্চি, ৪×৪ ইঞ্চি ৪×২ ইঞ্চি।

৫.২ ফলকের অবস্থান: দশাবতারের ফলকগুলিকে আমরা সাধারণত মন্দিরের প্রবেশ পথের ওপরের অংশে পর পর চিহ্নিত হতে দেখতে পাই আবার কখনও পৌরাণিক দেব দেবীদের সাথে কোন কোন অবতারকে দেখা যায়। এছাড়া মন্দিরের প্রবেশের একেবারে ঠিক ওপরের অংশটিতে দেখা যায়। এছাড়া মন্দিরের থাম বা পিলারের গাত্রে কৃষ্ণলীলার সাথে এদের দেখা যায়। আবার কোন কোন মন্দিরে মন্দিরের দুই পার্শ্বে দশাবতারের চিত্র ফলক আমরা চিত্রিত হতে দেখি। মন্দির গাত্রে দশাবতারের ফলকের অবস্থান প্রসঙ্গে ‘বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য’ শীর্ষক নামক গ্রন্থে প্রণব রায় মন্তব্য করেছেন—***“বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তিফলকগুলি বহু মন্দিরের সামনের অংশে দুপাশে উল্লম্ব খোপগুলিতে সাজানো হোত, অনেক সময় কার্ণিসের নীচে ধনুকাকৃতি অংশেও বসানো থাকতো। সতেরো শতক থেকে দশাবতার ফলকগুলি দেওয়াল প্যানেলে বসানো হতে থাকে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি বিষ্ণুর এই দশ অবতারের মধ্যে ‘বুদ্ধ’ অবতারের বদলে জগন্নাথ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে দেখা যায় এবং এই প্রথাই প্রায় সারা বাংলার মন্দিরে প্রচলিত হয়। মৎস্য ও কূর্ম মূর্তিতে চর্তুর্ভুজ বিষ্ণুর অর্ধমূর্তিও দেখা যায়। বিষ্ণুর বরাহ মূর্তি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একসময়। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায় মন্দিরে (জোড়বাংলা) জলমগ্না পৃথ্বীদেবীকে বরাহাবতার বিষ্ণুর উদ্ধার দৃশ্যটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিষ্ণুর নৃসিংহ মূর্তিও বেশ জনপ্রিয়। আঠারো উনিশ শতকের মন্দিরে বামনমূর্তি গুলিকে পরিব্রাজকবেশী ছত্রধারীরূপে দেখানো হয়েছিল। হলধারী বলরাম এবং পরশুধৃত পরশুরাম, ধনুর্বাণের দ্বারা রামচন্দ্র ও অশ্বারূঢ় অবস্থায় কল্কি অবতারকে দেখা যায়। প্রায়শই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার টেরাকোটা ফলক লক্ষ্য করা যায়”।*** [৩]

৫.৩. নকশা: মূলত চৌকোণা চ্যাপ্টা আকারের ফলকে দশাবতারের ফলকগুলিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ভট্টবাটি গ্রামে লম্বা আকারের বেশ বড় ধরনের ফলকে মন্দিরের পার্শ্বের দেওয়ালে মৎস্য, বামন ইত্যাদি অবতারের ফলককে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বিষ্ণুপুর, বীরভূমের কিছু স্থান, পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অঞ্চলে দশাবতারের চ্যাপ্টা চৌকোণা যে সমস্ত ফলকগুলি দেখা যায় সেই সমস্ত ফলকগুলির চারধারে আমরা ফুল লতা পাতা ইত্যাদির নকশা দেখতে পাই। এছাড়া পৌরাণিক দেব-দেবী এবং পৌরাণিক আখ্যানের সাথে দশাবতারের সব কটি অবতার না দেখা গেলেও যে কটি অবতার দেখা যায় সেই সমস্ত অবতারের ফলকের চারপাশেও আমরা উদ্ভিদ জগৎকেন্দ্রিক ফুল লতা পাতার নকশা দেখতে পাই। এছাড়াও আমরা বাংলার অনেক জায়গায় মন্দিরে দশাবতারের ফলকে কোন অবতারের মূর্তিটির পাশেই বিভিন্ন ফুল লতা পাতার নকশা দেখতে পাই। এছাড়া মন্দিরের সম্মুখ ভাগ এবং ওপরের অংশে যে সারিবদ্ধ প্যানেলে দশাবতারের ফলকগুলি দেখা যায় সেই ফলকগুলির চারধারে আমরা জ্যামিতিক এবং উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক নানান নকশা দেখতে পাই যা মন্দিরের নান্দনিক সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আবার অনেক পিলারের বা থামের গায়ে পৌরাণিক দেব দেবী বা কৃষ্ণলীলার ফলকের সাথে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারের ফলকও দেখা যায়। এই সমস্ত ফলকের চারধারে আমরা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক এবং জ্যামিতিক নকশার চিত্র প্রতিস্থাপন হতে দেখি।

৫.৪. মূর্তির ধরণ ও গঠন: মন্দির গাত্রে প্রতিস্থাপিত ফলকের ধরণ ও গঠন বাংলার এক এক স্থানে এক এক রকম আমরা দেখতে পাই। কোথাও বা ফলকগুলি একেবারে মন্দিরের দেওয়ালের সাথে সেঁটে বা লেগে রয়েছে আবার কোথাও মন্দিরের দেওয়াল থেকে কিছুটা ওপরের দিক করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দশাবতারের ফলকগুলিও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে

প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দশাবতারের এক একটা অবতারের এক এক রকম দৌহিক ধরণ ও গঠন। আবার কোন কোন অবতার মানুষ ও জীব জন্তুর সমন্বয়ে তৈরি। মন্দির নির্মাণকারী দক্ষ শিল্পীদের নিপূণ হাতের ছোঁয়ায় দশাবতারের মূর্তির দৌহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ তাই খুব স্পষ্ট ভাবেই মন্দির গাত্রে প্রতিস্থাপিত ফলকের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ অবতারদের যেমন আমাদের চিহ্নিতকরণ করতে অসুবিধা হয় না ঠিক তেমনি বামন, পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি, রাম ইত্যাদি অবতারকেও সহজে চিহ্নিত করা যায়। দশাবতারের প্রত্যেকটি মূর্তি ফলকেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রয়েছে। তাদের বেশ-ভূষা, অলংকার, দৌহিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা সবেতেই একটা ফলক থেকে অন্য ফলকের পার্থক্যের ছাপ সুস্পষ্ট। মন্দিরের সামনের অংশ এবং দুই পার্শ্বে ফলকগুলি একেবারে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যা জীবন্ত রূপে দর্শক সাধারণের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

৬. দশাবতারের কাহিনি ফলক চিত্রণের প্রেক্ষিত: বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অজস্র টেরাকোটার মন্দির গাত্রে আমরা বিবিধ ধরনের কাহিনি চিত্রকে প্রতিফলিত হতে দেখি। এই সমস্ত কাহিনি চিত্রগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে শুধুমাত্র মন্দিরের নান্দনিক সৌন্দর্যকেই বৃদ্ধি করা হয়নি, এর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সময়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকগুলিও। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে— বাংলার এমন কোন মন্দির গাত্র নেই যেখানে পৌরাণিক আখ্যানের কোন ফলক নেয়। পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে আমরা দেখতে পাই— রামায়ণের কাহিনি, মহাভারতের কাহিনি, কৃষ্ণলীলার কাহিনি, দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্র ফলক ইত্যাদি। আর এই সমস্ত পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে রামায়ণ এবং দশাবতারের কাহিনি চিত্রের ফলক অতি মাত্রায় স্থান করে নিয়েছে বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের গাত্রালংকারে।

মন্দির গাত্রে প্রতিস্থাপিত এই সমস্ত পৌরাণিক আখ্যান বা পৌরাণিক দেব-দেবীদের কাহিনি চিত্র গুলি অকারণে প্রতিস্থাপিত করা হয়নি। এইসব চিত্র ফলক ব্যবহারের কোন না কোন প্রেক্ষিত তো অবশ্যই রয়েছে। এবারে নিম্নে আমরা আলোচনা করবো বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে দশাবতারের কাহিনিচিত্রের ফলক ব্যবহারের প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে:

প্রথমত: পৃথিবীতে যখনই কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তখনই ভগবান বিষ্ণু এক একটি অবতারের রূপ ধরে এই পৃথিবীতে এসে জগৎবাসীকে উদ্ধার করে দিয়ে গেছেন। তাই বাংলার টেরাকোটা মন্দির গাত্রের অলংকরণে আমরা মন্দিরের সামনের অংশে এবং দুই পার্শ্বে এই দশাবতারের ফলক দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত: বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের গাত্র অলংকরণে সবচেয়ে বেশি স্থান করে নিয়েছে পৌরাণিক ঘটনা যুক্ত বিভিন্ন কাহিনি ফলক, একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আর এই পৌরাণিক দৃশ্যের ফলক চিত্রণ করতে গিয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবী ও পৌরাণিক কাহিনিচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে দশাবতারের কাহিনিচিত্রের ফলকও চলে এসেছে।

তৃতীয়ত: এই দশাবতার হল ভগবান বিষ্ণুর এক একটি রূপ। সুতরাং ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম বর্ণন প্রসঙ্গেও আমরা মন্দিরগাত্রে দশাবতারের ফলক দেখতে পাই।

চতুর্থত: মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক দেব-দেবীদের সাথে দশাবতারের সবকটি অবতারকে দেখা না গেলেও মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারকে দেখা যায়।

পঞ্চমত: কৃষ্ণলীলার কাহিনি চিত্রের সঙ্গেও আমরা কয়েকটি অবতারকে দেখতে পাই।

ষষ্ঠত্ব: এই ধরাধামে বিষ্ণুর দশাবতারের মাহাত্ম বর্ণনা প্রসঙ্গেও মন্দিরগাত্রে দশাবতারের ফলক ব্যবহৃত হয়েছে।

সপ্তমত: অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠাকারী রাজা বা জমিদাররা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হওয়ার ফলেও তাদের প্রতিষ্ঠা করা মন্দিরগাত্রে আমরা এই দশাবতারদের দেখতে পাই।

অষ্টমত: অশুভ শক্তির বিনাশকারী রূপেও নৃসিংহ, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারগুলিকে মন্দিরগাত্রে কোন কোন জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

নবমত: বিভিন্ন পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্যে আমরা দশাবতারের কাহিনির উল্লেখ পাই। সেই সমস্ত গ্রন্থগুলি পড়ে উজ্জিবিত হয়ে তৎকালীন সময়ে মন্দিরগাত্রে দশাবতারের কাহিনি চিত্র প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

উপসংহার: বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের গাত্রালংকারে দশাবতারের কাহিনি চিত্রের ফলক এক গুরূত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দশাবতার আসলে হল ভগবান বিষ্ণুর এক একটা রূপ। এই পৃথিবীতে যখনই কোন ঝড় ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়েছে তখনই ভগবান বিষ্ণু এক এক অবতার রূপে এসে এই পৃথিবীকে রক্ষা করে গেছেন, আর তার সাথে এক একটা যুগের অবসান হয়ে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মাহাকাব্য, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিতে দশাবতারের প্রসঙ্গ ব্যাড়

ব্যাড় উঠে এসেছে। তাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বিষ্ণুর দশাবতারের বর্ণনা রয়েছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত টেরাকোটার মন্দিরগুলিতে বিষ্ণুর এই দশাবতারের নানান সারিবদ্ধ প্যানেল বা একক ফলকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আমরা দেখতে পাই, যার মধ্যে দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর অবতারত্ব লাভের চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। সার্বিক বিচারে দেখা যায়, বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণে এও দশাবতারের প্রতিমূর্তি মোটিফ হিসাবে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীরা টেরাকোটার ফলকে শিল্প মোটিফ হিসাবে দশাবতারের প্রতিমূর্তি সৃজনে তাদের অসাধারণ নৈপুণ্যতারও পরিচয় দিয়েছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. en.wikipedia.org\wiki\dashavatar, viewed on 07.08.2017
২. ঘোষ, নীহার (ভাষান্তর শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১২,
পৃষ্ঠা নং- ১৪৪।
৩. রায়, প্রণব, বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং- ১২১।

গ্রন্থপঞ্জী:

ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৮০।
ঘোষ, নীহার (ভাষান্তর শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), বাংলার মন্দির শিলপ শৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১২।
মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী ও অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫।
বসু, শ্রীলা ও অভ্র বসু, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৫।
রায়, প্রণব, বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভার্স্কয, মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯৯।
ভট্টাচার্য, শম্ভু, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, কলকাতা: মনন প্রকাশন, ২০০৯।
সান্যাল, হিতেশরঞ্জণ, বাংলার মন্দির, কলকাতা: কারিগর প্রকাশনী, ২০১৫
সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৮।

ওয়েবসাইট:

en.wikipedia.org\wiki\dashavatar, viewed on 07.08.2017
https:\\en.m.wikipedia.org viewed on 12.05.2017
w.w.w.hindismfacts.org viewed on 25.012.2017
w.w.w.divineavatars.com viewed on 05.03.2017